



**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 665 - 674

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

## জীবনানন্দ-পরবর্তী বাংলা কবিতায় ‘প্রাণী প্রতীক’-এর ব্যবহার : অন্তরালের আত্মসমীক্ষণ ও সমাজবীক্ষণ

অনন্যা ঘোষ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

বিশ্বভারতী

Email ID: [ananya863@gmail.com](mailto:ananya863@gmail.com)

 0009-0001-0226-0979

**Received Date 20. 01. 2026**

**Selection Date 10. 02. 2026**

### **Keyword**

Human,  
Animal,  
Existentialism,  
Symbolism,  
Surrealism,  
Self-  
Introspection,  
Social  
Observation,  
Poetry.

### **Abstract**

Human is the most intellectual being among all animals in the world. But the existence of human is not self-sufficient. Existentialist philosopher John Macquarrie formed the notion of a inter-related dependence of human and the world. Before that Martin Heidegger also talk about the ‘Being-in the- world’, where his focus is on the relation of the ‘Dasein’ and the ‘Worldhood of the world’. On that sense, the existence of human is related with lives of the other animals, that flows parallel. The relation of human and animals in our concern are severally discussed with the base of some theories like –Animalism, Animism and Totemism. In Western Art and literary movements like Surrealism, Magic Realism and Symbolism, we can find poets and artists expressing the characteristics of an individual and the society with the symbols of animals. In 20<sup>th</sup> century after the great era of Rabindranath, the new generation of Bengali Poetry had a great impact of western philosophy and the notions of western art. Jibanananda Das was actually the pioneer, who had used several symbols of animals like ‘owl’, ‘horse’ and ‘mouse’ as well to portray the self introspection and the hollowness of the society. The time was not convenient at all. World wars, rise of Imperialism, Fascism, partition and degenerative condition of socio-economy of the country, destruction of the values of the middle-class people had lead the whole society to a void. Poets after Jibanananda Das became inspired to use the symbol of animals to create a pictorial overview of the society as well they used it as a mirror of self – introspection. Manindra Gupta, Pabitra Mukhopadhyay, Bhaskar Chakraborty, Buddhadeb Dasgupta and Sudhir Dutta were the few selected poets, who have used animals as the imagery to create a whole scenario of self-introspection and social observation in their respected poetry.

**Discussion**

কবিগুরুর গানে শোনা যায়, ‘বিশ্বভরা প্রাণ’-এর মাঝে আত্মসত্তার অবস্থান খুঁজে পাওয়ার অপার বিস্ময়বোধের বহিঃপ্রকাশ। বস্তুত, এই ‘বিস্ময়’ থেকেই দর্শনের উৎপত্তি। বৃহত্তর অভিব্যক্তনায় দর্শন মূলত ব্যক্ত করে আত্মজ্ঞান ও জগত সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি লাভের কথা। সময়ান্তরের প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের বোধের দর্পণে বিচিত্র মুদ্রায় অঙ্কিত হয়েছে আত্মজ্ঞান ও বিশ্ববীক্ষা লাভের এই প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদর্শনের ভাবনায় যেভাবে ধরা পরে ঔপনিষদিক অখন্ডচিত্তার বোধ, সেভাবেই বিশ শতকীয় অস্থিতিশীলতায় বদলে যায় মানুষের অস্তিত্ব অনুসন্ধানের অভিমুখ।

**এক**

মানব অস্তিত্বের অবিরাম ধারাবাহিকতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে অনেক সময়ই মানবীয় জগত ও পারিপার্শ্বিক জগত বিশেষত জীবজগতের এক পারস্পরিক ছেদবিন্দু তৈরি হয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক ম্যাকারি (Macquarrie) তাঁর ‘Existentialism’ গ্রন্থে মানুষের অস্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিক জগত (world) বা পরিবেশের (environment) এক উভমুখী সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ‘World’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে দুটি শব্দের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। একটি ‘Wear’ যার অর্থ ‘মানুষ’ বা ‘Man’ এবং অপরটি হল ‘Old’ যার অর্থ ‘Era’ বা ‘Age’ বা ‘সময়’, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ‘World’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ ‘Era of Man’। ম্যাকারির অভিমতানুযায়ী, মানুষের অস্তিত্ব-অনপেক্ষ জগতের কোন সুনির্দিষ্ট অবস্থান থাকতে পারে না কারণ—

“world is not just thing that is, but everything that forms the human environment and provides the setting in which human life has to be lived.”<sup>1</sup>

মানুষ জগতের আপাত বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিকে সমীভূত করে এক যথার্থ আকার দান করে। যদিও ম্যাকারি মতে প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাকে আত্মগত ভাববাদের ধারণার সমগোত্রীয় রূপে গ্রহণ করলে তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা খণ্ডিত থেকে যায়। মানব অস্তিত্ব ব্যতিরেকে জগতের অস্তিত্ব যেভাবে অলীক, অপূর্ণ ধারণামাত্র, সেভাবেই জগতের অনপেক্ষ মানুষের অস্তিত্বও অসম্ভব—

“Perhaps it is now time to redress the balance with the compensating assertion that there is no human existent apart from the world in which he exists.”<sup>2</sup>

অর্থাৎ মানবীয় স্ব-সত্তার উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন জাগতিক পরিবেশের অন্যান্য সত্তার উপস্থিতি, যারা একেকটি চিত্তার কেন্দ্ররূপে পৃথিবীকে রূপদান করে, এই প্রসঙ্গে অপর অস্তিত্ববাদী দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য, যিনি ব্যক্তির সঙ্গে অন্যান্য জাগতিক সত্তার সম্পর্ক নির্ণয়ে ‘Being-in-the-World’ - এর ধারণা প্রদান করেছেন। হাইডেগার কথিত ডাজিয়েন (Dasein)- এর ধারণা জগতের মধ্যে সত্তার বিশেষ অবস্থানকে চিহ্নিত করে। ‘বিশ্ব বা জগত এবং ডাজাইন বা সত্তা—এ দুয়ের মধ্যে বোধগম্য কোন পার্থক্য করা যায় না’।<sup>3</sup> জগত ও ডাজিয়েনের মধ্যে অবিরত ত্রিা-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হই, কিন্তু একইসঙ্গে জগতের মধ্যে স্ব-সত্তার অবলুপ্তি নিরোধে তার স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধিও গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বাতন্ত্র্য আসলে মানুষের একটা ‘অস্ফুট কর্মশক্তি, সম্ভাবনাময় বিরাট ক্ষমতা’।<sup>4</sup> সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে জগতের যথার্থ নির্বাচন সম্পর্কে উদ্ভূত উদ্বেগের মাধ্যমে মানুষের স্ব-সত্তার স্বাতন্ত্র্যের উপলব্ধি ঘটে। ব্যক্তির স্ব-সত্তা সমগ্র জাগতিক সত্তার সংস্পর্শে নিজের সম্ভাবনাগুলি খুঁজে পায়, তার সংস্পর্শে স্বাতন্ত্র্যে সমর্থ হয়। মানুষ এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। পারিপার্শ্বিক জগত, বিশেষত জীবজগতের সংস্পর্শে তার সুশু সত্তার জাগরণ ঘটে, যা তার চিন্তা ও কর্মকে প্রভাবিত করে। মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক প্রাণীজগতের পারস্পরিক সংযোগ কীভাবে তার বৌদ্ধিক ও অনুভূতির জগতকে প্রভাবিত করে সেই ধারণা সম্পর্কে উত্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন তত্ত্বদর্শনগত মত —

(১) প্রাণীবাদ (Animalism)

(২) সর্বপ্রাণবাদ (Animism)

(৩) টোটেমবাদ (Totemism)

স্নোডন (Snowdon), ইনওয়াগেন (Inwagen), আয়ার্স (Ayers), কার্টার (Carter), ওলসন (Olson) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ প্রাণীবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দান করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী মানুষকেও (human) জৈবিক মানদণ্ডে বিচার করে তাকে একটি প্রাণী বা ‘হোমো সেপিয়েন্স’ রূপে পর্যবেক্ষণ করা হয়।<sup>৭</sup> এক্ষেত্রে মানুষ (human)ও ব্যক্তি (person) দুটি পৃথক সত্তা। ‘মানুষ’ সম্পূর্ণ জৈবিকভাবে বিচার্য এবং ‘ব্যক্তি’ তাঁর চেতনা, বুদ্ধি ও যুক্তি নিয়ে পরিপূর্ণ। জন লক চৈতন্যের ধারাবাহিকতার মাধ্যমে দেহ ও আত্মার মধ্যে যে জটিল সম্পর্কের কথা বলেন, প্রাণীবাদ তার সম্পূর্ণ বিপরীতে জৈবিক সংগঠনের ধারাবাহিকতাকে গুরুত্ব দান করে। জর্জ অরওয়েল তাঁর ‘Animal Farm’ গ্রন্থে প্রথম প্রাণীবাদের ধারণাকে সাহিত্যিকভাবে গ্রহণ করেন, যেখানে মানুষের সামাজিক চরিত্র, জৈবিক প্রবৃত্তিকে পশুর রূপকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অন্যদিকে এডওয়ার্ড টাইলর (Edward Tylor) তাঁর ‘Primitive Culture’ গ্রন্থে সর্বপ্রাণবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। সর্বপ্রাণবাদ কোনো বিচ্ছিন্ন কাল্পনিক মতবাদ নয়, বরং সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে মানুষের চিরাচরিত মানসপ্রবাহের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এক ধারণা। দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রাণবাদ অনেকাংশে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাক-সভ্যতা পর্ব থেকেই বিভিন্ন উপজাতির মানুষের সাংস্কৃতিক বিশ্বাস অনুযায়ী মনুষ্যের প্রাণী বা নিছক চাঁদ, সূর্য, নক্ষত্র ইত্যাদি জড়বস্তুর মধ্যেও আত্মা বা প্রাণের উপস্থিতি রয়েছে। মানুষের মতোই তারা মহাবিশ্বের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে—

“To the lower tribes of man, sun and stars, trees and rivers, winds and clouds become personal animate creatures. Leading lives conformed to human and animal analogies, and performing their special functions in the universe with the aid of limbs like beasts or of artificial instruments like men.”<sup>৮</sup>

আবার, টোটেমবাদের ধারণাটি একেবারেই মানুষের কৌম সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। জেমস জর্জ ফেজার (James George Frazer) তাঁর ‘Totemism and Exogamy’ গ্রন্থে টোটেম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে বলেন—

“As distinguished from a fetich, a totem is never an isolated individual, but always a class of objects, generally a species of animals or of plants, more rarely a class of inanimate natural objects, very rarely a class of artificial objects.”<sup>৯</sup>

অর্থাৎ, ‘টোটেম’ মূলত প্রাণীগোত্রীয় হয়ে থাকে, যা বিশেষ কৌম সংস্কৃতির সংস্কার ও বিশ্বাসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। টোটেম মূলত তিন প্রকার হয়ে থাকে — ১. জাতিগত টোটেম (জাতিগত পরম্পরায় প্রচলিত), ২. ব্যক্তিগত টোটেম (ব্যক্তিগত আত্মার সঙ্গে জড়িত এবং ঐতিহ্যসম্প্রদায়ের প্রাপ্ত নয়) ও ৩. যৌন টোটেম (একটি গোষ্ঠীর সকল নারী অথবা পুরুষের মধ্যে প্রচলিত)। মূলত মিথ বা লোকসাহিত্যে টোটেম প্রসঙ্গের অবতারণা লক্ষ্য করা যায়।

দুই

সাহিত্যে, বিশেষত লোকসাহিত্যে মানবের প্রাণীর প্রতীকে সমাজ ও রাজনীতির বৃহত্তর চরিত্র উদ্ঘাটনের প্রয়াস বহুকালাবধি প্রচলিত। আধুনিক সাহিত্যের বহুক্ষেত্রে এই ধারা ভিন্ন চিন্তাসূত্রে বহমান হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সময়ে এই বিশেষ প্রবণতার অভিমুখ অনুসন্ধানের চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে রবীন্দ্র বিরোধিতার মাধ্যমে বাংলা কবিতায় যে আধুনিক ধারাটির সূত্রপাত হয়েছিল সেক্ষেত্রে বিশেষ অভিঘাত লক্ষ্য করা গিয়েছিল পাশ্চাত্যের প্রতীকবাদ, পরাবাস্তবতাবাদ, জাদুবাস্তবতাবাদ প্রভৃতি শিল্প আন্দোলনের। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে ‘Le Figaro’ পত্রিকায় জাঁ মোরেআসের ব্যবহৃত ‘Symbolisme’ শব্দটির দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করে প্রতীকবাদ, যার মূল বক্তব্য হিসাবে পরবর্তীকালে ‘প্রথম দ্রষ্টা’ কবি বোদলেয়ার বলেন, ‘অদৃশ্যকে দেখার, অশ্রুতকে শোনার ও ইন্দ্রিয়সমূহের বিপুল ও সচেতন বিপর্যয় সাধনের দ্বারা অজানায় পৌঁছানোর’<sup>১০</sup> কথা। অন্যদিকে, ১৯২৪ সালে আন্দ্রে ব্রেঁট ‘Manifesto of Surrealism’ - এর মাধ্যমে সূচিত সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের মূলকথা ছিল ‘যুক্তি, বুদ্ধি ও চেতনার গতানুগতিক পদ্ধতি ত্যাগ করে মানুষের অবচেতনের উন্মোচন’।<sup>১১</sup> শব্দের বহুমাত্রিক অর্থপ্রকাশ বা অবচেতনের অকপট আত্মপ্রকাশের উদ্দেশ্যে

কবিতার প্রতীকি ব্যঞ্জনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবজগতের বহু উপাদানের ব্যবহার তৎকালীন পাশ্চাত্য কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য হিসাবে এডগার অ্যালান পো রচিত 'The Raven', গিয়াম অ্যাপোলনিয়ারের 'The Lion', 'The Owl', ত্রিস্তান করবিয়েরের 'Toad' প্রভৃতি কবিতার নাম করা যেতে পারে।

বাংলা কবিতায় প্রথম জীবনানন্দ দাশ স্ব-সত্তার বিচিত্র ভঙ্গি ও জগতদর্শনের অভিজ্ঞান চিহ্নিত করেছেন পশুপাখির প্রতীকের মাধ্যমে। এক বিষণ্ণ পৃথিবীর অবক্ষয়ী সংকটের ভাবলোকে দাঁড়িয়ে তিনি গ্রহণ করেছেন সাহিত্যে তথাকথিত 'অপাংক্তেয়' থেকে যাওয়া পশুপাখির প্রতীকি ভাবনা, যা স্পষ্ট করেছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অস্তিত্বের অনন্ত অমার দিকটি। ক্রমাগত আত্মখননের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন অবচেতনে সমাহিত অনাবিক্ষৃত অস্পষ্টতাকে। চলাচল করেছেন বাস্তব থেকে পরাবাস্তবতার ভূমিতে। তাই তাঁর কবিতায় 'পেঁচা' হয়ে উঠেছে আবহমান জীবন, প্রজ্ঞা ও বোধের প্রতীক, 'শূকর' হয়ে উঠেছে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত সত্তার রূপ। আবার 'হরিণ'-এর প্রতীকে চিহ্নিত আবহমানের প্রেমিকসত্তার বিপ্রতীপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছে 'ঘাই হরিণী'-র দ্বারা প্রতীকায়িত আধুনিক বাণিজ্যিক সভ্যতার হৃদয়হীন, ছলনার দিকটি। 'আলোকপত্র' কবিতায় ধরা পড়ে কবির সামগ্রিক ভাবনাচিত্রটি—

“আজ এই পৃথিবীতে মানুষের মন  
 মনে হয়; অধঃপতিত এক প্রাণী”<sup>১০</sup>

### তিন

উত্তর-জীবনানন্দ যুগের বহু কবি তাঁদের কবিতায় প্রাণীর প্রতীক ব্যবহার করেছেন পরাবাস্তবতা, জাদুবাস্তবতা বা সাংকেতিকতার মোড়কে। কখনো নিছক মানব অবচেতনের নিগূঢ় প্রতিচ্ছবি আবার কখনো বৃহত্তর সমাজদর্শন কিংবা বৃহত্তর জগতের সঙ্গে সংযোগ তৈরীর প্রচেষ্টা এর পশ্চাতে কার্যকর থেকেছে। জীবনানন্দ পরবর্তীকালের কবিদের মধ্যে যাঁর কাব্যে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তিনি কবি মণীন্দ্র গুপ্ত। বিশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত কবি সাক্ষী থেকেছেন সভ্যতার সর্বাধিক অস্থির পর্বকালের। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের উত্থান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মারণযজ্ঞ, দেশভাগের যন্ত্রণায় মর্মান্বিত কবি তাই দাঁড়িয়েছিলেন তথাকথিত মুনাফালোভী, আত্মসর্বস্ব মানুষের বিরুদ্ধে প্রকৃতি আশ্রয় করে—

“আমি তো সবসময় চেয়েছি — লোকসংখ্যা কমুক, বৈভব, তৈজস কমুক, শব্দ বাক্য কমুক। পাখি পশু বাডুক, বন বাডুক। পৃথিবী শান্ত সৌন্দর্যে টলমল করুক। মানুষের মুখরতাকে চাপা দিয়ে যাক বনমর্মর।”<sup>১১</sup>

কবির আত্মজীবনী 'অক্ষয় মালবেরি'-তে দৃষ্ট প্রকৃতির বৃক্ষ ও প্রাণীর সঙ্গে তাঁর আশৈশবের হৃদয় সংযোগ তাঁকে আকৃষ্ট করে লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি, যার সূত্রে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি—

“আমি ভাববাদী নই, বস্তুবাদীও নই, হয়তো নাগা কুকিদের মতো সর্বপ্রাণবাদী।”<sup>১২</sup>

'শেয়াল' কবিতায় কবি যখন 'মধ্যপ্রদেশের এক গাঁয়ে' 'ক্ষণিক শেয়াল'-এর কথা বলেন, তখন যেন অবচেতনের এক সমান্তরাল জগত গড়ে ওঠে, যার নাগাল মানুষ কোনোদিনও পায় না, শুধু পায় আভাস। আবার, 'ময়ূর' কবিতায় ধরা পড়ে প্রকৃতির বিশুদ্ধতার বিপরীতে মানবীয় জগতের কৃত্রিমতার চিত্র। 'ইঁদুর বা মাকড়সা' কবিতায় 'ইঁদুর' যেন বোধতাড়িত কবিরই প্রতিরূপ। সুপ্ত-চৈতন্য মানুষের অবিরাম গড্ডলিকা প্রবাহের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি সময়ের গরল পান করে আত্মস্থ করেছেন জন্ম-মৃত্যুর রহস্য। তাঁর শেষ উপলব্ধি — 'সমস্ত বেদ আর প্রলাপ একই নর্দমা দিয়ে ভেসে চলেছে—'। চিত্রকল্পের মাধ্যমে দৃশ্যায়িত হয় আধুনিক মানুষের দিশাহীনতার চিত্র। সভ্যতার বাহ্যিক অগ্রসরণ ঘটলেও মানুষের প্রকৃত উত্তরণ আদৌ ঘটে কি? নাকি, ক্রমাগত আত্মকেন্দ্রিকতার বৃত্তে আবদ্ধ মানুষ বেছে নেয় এক অন্তঃসারশূন্যতাকে। বস্তুত, কবি যেন এই অসহ্য জীবনচক্র থেকে মুক্তি পেতে পরিচালিত হয়েছেন ফ্রয়েড কথিত 'Thanatos' বা 'Death Instinct'-এর দ্বারা, যা শেষপর্যন্ত পূর্ণ সমাপ্তির কথা বলেনা; বলে এক বিকল্প জীবনের কথা। যদিও সেই জীবনের স্থিরতা সম্পর্কেও রয়েছে একপ্রকার অনিশ্চয়তা। কবিতায় উঠে আসে এক পড়া বাস্তবিক জগত—

“মৃত হুঁদুর আর আমি ছাতে উঠে দেখি:  
জ্যোৎস্নারাত্রের বেগবান গহিন গম্ভীর নদীতে বান ডেকে  
চরাচর ভেসে গেছে—  
সেই আরকে ডুবে একতলা দোতলা সতেরোতলা বাড়ি,  
ফুটপাথ ট্রামডিপো গলিতাজ হয়ে ক্রমশ অন্তর্ধান করছে  
হুঁদুর এইমাত্র জন্মমৃত্যু ভেদ করে এসেছে  
‘ঐ দেখো, বেদ আর প্রলাপ একই নর্দমা দিয়ে ভেসে চলেছে—’  
হুঁদুর বললে আমি জানি না আমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে।’  
তারপরই সে মাকড়সার মতো আট- পা হল, পিঁপড়ের মতো  
ছয়-পা হল, মানুষের মতো দুই-পা হল,  
শেষে ডিমের মতো গোল হয়ে কাঁপতে লাগল, অধৈর্য, অস্থির।”<sup>১০</sup>

(‘হুঁদুর বা মাকড়সা’/ ‘শরৎ মেঘ ও কাশফুলের বন্ধু’)

বিশ শতকের পুঁজিবাদের ব্যাপক প্রসারের সূত্রে বাণিজ্যিক স্বার্থে বিনষ্টির সম্মুখীন হয়েছিল প্রকৃতি ও তার আদি এবং অকৃত্রিম জীববৈচিত্র্য। বহিরাগত আর্থ আক্রমণ থেকে শুরু করে বহুবার পৃথিবীব্যাপী রাজরক্তের বীরদর্পের আফ্রিকান শিকড়চ্যুত হয়েছে আদিম সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা। এই অবদমন বিশ শতকেও বহমান। আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলা তথাকথিত পুঁজিবাদী সভ্যতার স্বার্থপরতায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল প্রকৃতি ও প্রকৃতিলালিত মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। সেই জৈবিক ঔপনিবেশিকতাবাদের (Bio-Colonisation) চিরাচরিত শোষণ-শোষণের সংঘাত ও প্রকৃতিলালিত জীবনের উন্মূল হয়ে যাওয়ার বেদনা লক্ষ্য করা যায় ‘হাতি’ কবিতায়—

“কিন্তু তারপর গাছ ও হাতিদের উপর কর্তৃত্ব করতে সেখানে যিনি এলেন  
তিনি গাছও আর হাতিও না  
অতএব এসেই তিনি সুসঙ্গ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে  
রাজগির ব্যয়ভার চাপিয়ে দিলেন হাতিদের উপর  
জানা ছিল হাতির রাজস্ব দেবে না, অতএব আইন হল:  
অনাদায়ে তাঁদের ধরে এনে ক্রীতদাস করা হবে বা  
বিক্রী করে টাকা উসুল করা হবে।  
হাতি ধরার জন্য সুসংরাজ নিয়োগ করলে হাজংদের —  
জমির পত্তনি দিয়ে বসালেন নিজরাজ্যে।

এই হল গারো পাহাড়ের হাতি, সুসঙ্গের রাজবংশ এবং হাজংদের পূর্বকথা।”<sup>১১</sup>

(‘হাতি’/ ‘শরৎ মেঘ ও কাশফুলের বন্ধু’)

অনুরূপভাবে, ‘গভার’ কবিতায় মানুষের মানবিকতা ও বন্যপ্রাণীর হিংস্রতার যেন পারস্পরিক অবস্থান বদল ঘটে যায় কবি যখন বলেন — ‘অথচ মানুষের ভয়ংকর গন্ধ সে অদ্ভুতভাবে/ আধ মাইল দূর থেকেও পায়/ কিন্তু থাক, দুষ্ট প্রাণীটির কথা ভাবতে আজ তার ভালো লাগছে না’<sup>১২</sup> (‘গভার’/ ‘নমেরু মানে রত্নাক্ষ’), সহজেই অনুভূত হয়, মানুষের মানবীয় গুণের অবলুপ্তিতে তারা হয়ে উঠেছে বন্যপ্রাণীর সমগোত্রীয়। যদিও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির চিরন্তনতাই কবিতায় কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

## চর

ছয়ের দশকের অন্যতম প্রধান কবি ছিলেন পবিত্র মুখোপাধ্যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আর্থ-সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে তিনি নিজেকে চিহ্নিত করেছেন ‘স্বর্গ হতে ভ্রষ্ট বর্ণহীন ব্যথিত গোলাপ’ রূপে। ‘কবিপত্র’-এর সম্পাদক এক অনন্ত নাস্তির

মধ্যে ‘মানুষের অপরসীম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে’ শিল্পকে গ্রহণ করেছেন একমাত্র স্থির সত্যরূপে। মধ্যবিত্ত মানুষের অনুভূতিহীন দেহ ও আরোপিত নৈতিকতাকে তিনি বিচার করেছেন প্রাণীর প্রতীকায়িত ব্যবহারের মাধ্যমে তার ‘পশুপক্ষী’ সিরিজের কবিতায়। ‘গাধা’ কবিতায় প্রতিফলিত হয় মধ্যবিত্ত মানুষের অস্তিত্বের যন্ত্রণা। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে উদাসীন হয়ে যাদের আজীবন দুর্বল ভার বহন করে যেতে হয় পরিবার ও সমাজের। জন্মবীজে ‘চোখে যে ঠাণ্ডা নির্বোধ বিভ্রম’ ছিল সুস্থ জীবন যাপনের, ‘আত্মপরভেদে প্রেম বিতরণ’, ‘প্রহ্নহীন দানের মহিমা’ ও ‘ঘৃণা এবং লাঞ্ছনার ক্রমসহনীয়তা’-য় তা মিথ্যা হয়ে যায়। তবুও খুচরো সুখের চর্চিতচর্চনেই কেটে যায় ইহজীবনের জন্মার্জিত দায়। কারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মনে চিরস্থায়ী হয়ে থেকেছে মৃত্যু পরবর্তী অমৃতলোকে প্রবেশের এক অমল আশাবাদ —

“মৃত্যুকে অমৃত রাজ্যে প্রবেশের চাবি জেনে, মেনে নাও অতিথির পারবাশ্য  
 গুনে চলো দিন, আর তখতে আসীন প্রভু, সম্রাটের দায় যাতে মেটে, তার  
 কত আছে বাকি?

যেন মেলে না নিস্তার তার যে শুধু অক্ষম বইতে আপনার ভার যেন পলাতক কাটা ঘুড়ি ।

যাবেই সর্বস্ব তার চুরি, আহম্মক, ধর্মান্বিতার রাজপথে হাওয়া খেতে চলেছেন—

টানো প্রাণপণে জুড়িগাড়ি”<sup>১৬</sup>

(‘গাধা’/ ‘পশুপক্ষী সিরিজ’)

একইভাবে ‘কুকুর’ কবিতায় কবির শানিত ব্যঙ্গে বিদ্ধ হয় মধ্যবিত্তের নিখাদ প্রভুভক্তি ও মেরুদণ্ডহীনতার বিপরীতে ক্ষুৎপিপাসাকাতর অসহনীয় জীবন। অযথার্থ অস্তিত্বের ভারে ব্যথিত মধ্যবিত্ত মানুষ আত্মখাদক যন্ত্রণায় প্রতিদিন ব্যর্থ হতে দেখে ‘বহুজীবিতের নিষ্কাম কোলাহলে’ মুখরিত পৃথিবীকে তাঁর ‘কেঁচো’ কবিতায়। তবুও শেষে অস্তিত্বের মৌহূর্তিক অর্থ খুঁজে পেয়ে অবাঞ্ছিত মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে চায় প্রতিনিয়ত।

‘পিঁপড়ে’ কবিতায় ধরা পড়ে মানুষের বিধ্বস্ত ঐক্যচেতনা। আধুনিক মানুষের স্বাভাবিক সখ্যতা হারিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বন্দ্ব জর্জরিত হওয়া জীবন ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হয়ে নিয়ে যায় আত্মহননের পথে, প্রিয়হননের অভিমুখে। পিঁপড়ের এই সজ্জবদ্ধ জীবনবিন্যাসের কাছে কবি শিখে নিতে চেয়েছেন মানবতা, সজ্জবীবনের শান্তি ও আনুগত্য অস্তির সময়ে রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতে এক দেশ যখন অন্য দেশের বিরুদ্ধে তুলে নিয়েছে পরমাণু অস্ত্র, ব্যক্তি মানুষের স্বার্থপরতা ক্রমাগত অহং-এর বিচ্ছিন্ন দ্বীপে বন্দিভের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি বলেছেন —

“ইচ্ছে হয় জেনে নিই ওই ভাষা...তোমাদের স্বাভাবিক সখ্যতার ভাষা— খুব মানবিক লাগে

আমাদের স্বপ্ন, দেখি তোমাদের প্রাত্যহিক অভ্যাসে সফল,...যেন

এ গ্রহের নও, অন্য গ্রহ

থেকে এই পৃথিবীতে সজ্জ জীবনের শান্তি আনুগত্য;

প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব নিত্য অশ্রুপাত নেই।”<sup>১৭</sup>

(‘পিঁপড়ে’/ ‘পশুপক্ষী সিরিজ’)

পার্থিব মানুষের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা, অপারগতা ও স্নায়বিক দৌর্বল্যের বিপরীতে প্রাণীর জীবনধর্মকে দাঁড় করিয়ে কবি নির্মাণ করেছেন এক আত্মসমীক্ষণের দর্পণ। এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে অনাগত ভবিষ্যতের হাতে তুলে দিতে চান নির্দ্বন্দ্ব জীবনের ছাড়পত্র।

## পাঁচ

ছয়ের দশকের বিবিধ ধারার মধ্যে যে কবিদের ‘আত্মজৈবনিক’<sup>১৮</sup> রূপে চিহ্নিত করা হয়ে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মৃত্যুবোধ, বিষণ্ণতা ও আত্মকরণায় নিমগ্ন যাঁদের কবিতা, তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভাস্কর চক্রবর্তী। তাঁকে লেখা সুব্রত চক্রবর্তীর এক চিঠি থেকে জানা যায় ‘শীতল বিবেচনা ও সামাজিক ও ব্যক্তিগত crisis’<sup>১৯</sup> যে সময়ের কবিতার মূলে প্রোথিত রয়েছে, সেই কবিমানসের আত্মকেন্দ্রিকতার মূল উদ্দেশ্য ‘নিজেকে dialectically নানা বাস্তবতায় নুয়ে পড়া মানুষের ভিড়ে ও সমকালীন

ধর্মে তার পরিপ্রেক্ষিতে যাচাই করা সম্প্রসারিত করা’।<sup>২০</sup> নিরল্কার যন্ত্রণাদঙ্কতা থেকে মৃত্যুর শাস্তিময়তায় আত্মসমর্পণের ভাবনা ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় একাধিকবার এসেছে। ভাস্কর চক্রবর্তীর ‘মোষ’ কবিতাটি পাঠ করার অনুষ্ণে পাঠকের মনে আসতে পারে পরাবাস্তববাদী চিত্রশিল্পী সালভাদর দালির দিনলিপির প্রসঙ্গ যেখানে তিনি বলেছেন —

“If one analyses certain curves in my corpus Hypercubicus, one find almost divine curve of the rhinoceros horn which is the essential basis of all chaste and violent aesthetics.”<sup>২১</sup>

দালি নিজের প্রায় সব ছবিতেই মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছেন এই ‘গন্ডারের শিং’ এর প্রতিরূপ, যা তাঁর মতে বস্তুজগত-বহির্ভূত এক রহস্যময়তার ইঙ্গিতবাহী। এর নিখুঁত প্রতিসাম্য এক পবিত্র ও উগ্র নন্দনতত্ত্বের অপরিহার্য ভিত্তিরূপে শিল্পীর কাছে প্রতিভাত হয়। কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় বলেছেন —

“কোথায় কাদের চোখে বিদ্যুৎ বলসে ওঠে— তাঁরা রাত্রিবেলা  
 চুল খুলে পা ছড়িয়ে কাঁদে? কীভাবে বছর যায়, বছর বছর  
 যায়, আমি  
 তোমারই শিংয়ের কাছে গুঁড়ি মেরে বসে থাকি— কখন যে  
 চাঁদ ওঠে, কখন যে মেঘ  
 ঢেকে দিয়ে চলে যায় তোমাকে আমাকে”<sup>২২</sup>

(‘মোষ’/ ‘শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা’)

বস্তুত, কবিতায় প্রকাশিত হয় সময়স্বভাবজাত মানুষের বিষণ্ণতাবোধ, জীবন যাপনের নিত্যনৈমিত্তিক একঘেয়েমিজাত ক্লান্তি। এই চেতনাহীন যাপনচক্র থেকে মুক্তিকামী কবি শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে জান বিশুদ্ধ শিল্পের কাছে। সালভাদর দালির মতই ‘মোষের শিং’ কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কাছে হয়ে ওঠে অখন্ড নান্দনিকতাবোধের প্রতীক।

ভাস্কর চক্রবর্তীর শেষতম কাব্যগ্রন্থ ‘জিরাফের ভাষা’। এই কাব্যগ্রন্থের পূর্বে ‘জিরাফ’ নামাঙ্কিত এক স্বতন্ত্র কবিতার সন্ধান মেলে। একুশ শতকের বিশ্ব-সংস্কৃতির প্রভাবে আগত পণ্যায়ন, ক্ষমতাতান্ত্রিক আধিপত্যের ঘেরাটোপ, ও জীবনের বিচ্ছিন্নতায় ‘জিরাফ’ হয়ে ওঠে কবির আহত বোধের প্রতীক—

“যখন অনেক রাতে রক্তমাখা একটা জিরাফ উঠে আসে  
 উঠে আসে ভাষা থেকে, মাথা নাড়ে, বলে :  
 রাখো ওই তোমাদের ছাইমাখা খেলার সংসার  
 রাখো ওই মানুষের জন্য কান্না  
 পৃথিবীর জন্যে কান্না  
 তোমরা ভালবেসেছো শুধুই মোটা ডিপোজিট, হিংস্রতা  
 আজ রাতে প্রাণ চায় তুলো আর ডেটলের গন্ধ শুধু —”<sup>২৩</sup>

(‘জিরাফ’/ ‘কীরকম আছে মানুষেরা’)

এই ‘জিরাফ’ উঠে আসে ভাষা থেকে, যে ভাষা একমাত্র কবিরই বোধগম্য। সমস্ত চিত্তকৃত প্রতিবাদ ও বিলাপের প্রতি নির্লিপ্ত এক নৈঃশব্দের ভাষা, যা আগাগোড়া চিনিয়ে দেয় সভ্যতার মর্মমূলে থাকা ক্ষতস্থান — মানুষের নীরক্ত আবেগ, হৃদয়হীনতা ও পণ্যসংস্কৃতির বাণিজ্যিক স্বার্থসিদ্ধি। তাই কবিপ্রাণ আজ চায় সেই ক্ষতের শুশ্রূষা। যদিও নিরাময়ের আশা বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু কবি যখন কবিতার শেষে বলেন — ‘বেঁচে যাবো বেঁচে যাবো ভাবি শুধু/ যখন অনেক রাতে রক্তমাখা একটা জিরাফ’,<sup>২৪</sup> পাঠকের বোধগম্য হয় যে একান্ত বোধের তাড়নাই কবিকে নিয়ে যায় এক বিকল্প পরিসরের সন্ধান। এক রহস্যময়তায় নির্মিত হয়ে যায় নতুন কোন পৃথিবীর আকল্প।

ছয়

ছয়ের দশকের ভিন্নধারার কবিদের মধ্যে অপর একজন ছিলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত। কবিতায় তিনি নির্মাণ করেছেন একের পর এক পরাবাস্তবিক দৃশ্য, যার অভ্যন্তরে নিহিত থেকেছে মানব অস্তিত্বের বিপন্নতাবোধ, শিল্পীর সামাজিক দায়বদ্ধতা। ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর ‘হিমযুগ’ কাব্য। এই কাব্যের কবিতাগুলি রচিত হয়েছে বাংলা তথা ভারতবর্ষের এক অস্থির রাজনৈতিক কালপর্বে। নকশাল আন্দোলন, একদল তরুণের সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার আস্থান, ভয়াবহ প্রশাসনিক দমন-পীড়ন — প্রতিটি ঘটনার স্পন্দন অনুভূত হয় কাব্যের স্তর থেকে স্তরান্তরে। নামকরণেও রয়েছে সময়ের প্রতিবিম্বন। এই যুগ যেন মৃত্যুশীতল বক্ষ্যাসময়ের কথা বলে, যার আসলে কোন উত্তরণ নেই নাকি বলা যায়, মানুষেরই হিংস্রতার বিরুদ্ধে মানুষের অস্তিত্ব যখন বিপন্ন, কবি ফিরে যেতে চেয়েছেন পৃথিবীতে প্রাণসৃষ্টির পূর্বে, যেখানে ‘হিংস্রতা’ কিংবা ‘প্রতিদ্বন্দ্বিতা’-র মতো শব্দের জন্ম হয়নি। তাই হয়তো এই কাব্যে কোনো পূর্ণাঙ্গ মানুষের কথা আসে না, আসে ‘গাধা’, ‘লাল পিঁপড়ে’, ‘কেঁচো’, ‘গোরু’-র মত কিছু প্রাণী জড়বস্ত্র ও মানুষের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কথা। ‘টিকটিকি’ কবিতায় কবি ও কবিতার কথক যেন দুই পৃথক অস্তিত্ব হয়ে ওঠে। অন্যদিকে ‘তোমরা’ অর্থে যেন সেইসব মানুষদেরই চিহ্নিত করা হয়, যারা চিরকাল ক্ষমতার কেন্দ্রে থেকে অন্যের শোষিত জীবনের উপর গড়ে তুলেছে স্বার্থসিদ্ধির ইমারত। টিকটিকি যেন সর্বহারাদেরই একজন। অপমান, ভয় তুচ্ছ করে যে আজ জানান দেয় নিজের অবস্থান—

“দেখতে দেখতে ফুলে উঠেছে শরীর, আজ  
 শেষ পর্যন্ত আমি হয়ে উঠতে পারলাম ভয়ংকর  
 সেই ডায়নোসরাস, যা হয়ে ওঠার জন্য  
 ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতে হয়েছে আমাকে। এফুনি  
 বিশাল হাঁ- করে তেড়ে আসব আমি  
 পোকামাকড় ও তোমাদের দিকে,”<sup>২৫</sup>

(‘টিকটিকি’/ ‘হিমযুগ’)

একইভাবে ‘ইঁদুর’ কবিতায় ‘ইঁদুর’ হয়ে ওঠে স্বপ্নতড়িত মানুষের প্রতিনিধি, যে স্বপ্ন সুপ্তির নয় বরং আত্মচৈতন্য জাগরণের। সাতের দশকে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়, যেখানে বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা বলে মনে হয়, সেই কালপর্বে নিতান্ত গডলিকা প্রবাহের বিরুদ্ধস্রোতে ভেসে থাকা এক মানুষের মনে হয় বিষাদের কালো মেঘের আবরণ ভেদ করে নেমে আসছে সোনালী দিনের স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের উৎকর্ষাই চৈতন্যকে জাগ্রত রাখে প্রতিনিয়ত—

“ছোট এক টুকরো আকাশ ফুঁড়ে আজ কেবলই  
 নেমে আসছে তোমার স্বপ্নের সোনালী জাঁতাকল,  
 নেমে আসছে প্রত্যেক দিনের মত আবার একটা সকাল—

কী হবে, কী হবে আবার সকাল হলে?”<sup>২৬</sup> (‘ইঁদুর’/‘হিমযুগ’)

সাতের দশকের বাংলা কবিতার যে রাজনৈতিক অভিমুখ, যেখানে বলিষ্ঠ ভাষায় উঠে এসেছে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির অবক্ষয়ের স্থিরচিত্র, নির্মিত হয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতায় সেই পরিচিত আঙ্গিক নেই যদিও সময়ের দায়বদ্ধতাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। বাস্তবকে রূপায়িত করতেই বাস্তবের সমান্তরালে কবি সৃষ্টি করেন এক বিকল্প বাস্তব, নির্মাণ করেন extended reality।

### সাত

প্রথম কাব্য ‘ব্যাভেল টাওয়ারের চূড়া’ (১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ) প্রকাশের নিরিখে আটের দশকে বাংলা কাব্যজগতে আবির্ভূত হলেও সমসাময়িক কালপর্বের একজন নিঃশব্দ অথচ নিমগ্ন কবিরূপে সুধীর দত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠা। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তার ‘প্রাকপুরাণ’ কাব্যগ্রন্থটি। সর্বমোট ২২টি কবিতার সমাহারে কাব্যগ্রন্থটি গ্রন্থিত হলেও সমগ্র কাব্য জুড়ে রয়ে গিয়েছে একটি মাত্র অভিব্যঞ্জনার অবাধ প্রবাহমানতা — সৃষ্টির আদিম স্তরের গোষ্ঠীজীবন থেকে আগামীর কল্পনায় পরিবাহিত অখন্ড চৈতন্যপ্রবাহ। মণীন্দ্র গুপ্তের ভাষায় —

“যে প্রসঙ্গটি সুধীর প্রায় প্রথমাবধি তাঁর চিন্তা চেতনায় বহন করে চলেছেন তা হল, আদিম দিনগুলি থেকে বর্তমান ভবিষ্যতের দিকে মানুষের পথ অতিবাহন। কিন্তু এসব তো হল পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের বিষয়। আর ইতিহাস ও বিজ্ঞান নিজেরা তো কবিতা নয়। অতএব এই বিষয়ে নিষিদ্ধ সুধীরের কবিমন মানুষের সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনর্গঠন করেছে।”<sup>২৭</sup>

কবি যেন নিজেই হয়ে ওঠে আদিসৃষ্টি, প্রকৃতির প্রতিক্রম, যার ‘গর্ভ ছিঁড়ে প্রত্যুষ দেখল’ শিবালিকমালা। ‘আনুষ্ঠানিক’ কবিতায় কবি হয়ে ওঠেন আদিম গোষ্ঠীজীবনের শরিক। উঠে আসে ভালুকের প্রসঙ্গ। এখানে প্রাণী প্রতীকের ব্যবহার করেছেন করেছেন কবি আদিম কৌমসংস্কৃতি টোটেমবাদের অনুষ্ণে। ‘ভালুক’ গোষ্ঠীজীবনের টোটেম, কৌমসংস্কৃতির বিশ্বাস, সংস্কার ও কল্পনার এক সামগ্রিক চিত্র উঠে আসে যার মাধ্যমে। কবিকল্পনায় মানুষের আদিম সমাজের ত্রুরধর্মের কথা উঠে আসে পরম আন্তরিকতায়। কিন্তু কেন এই অতীতচারণা? উত্তরানুসন্ধানে ফিরে যেতে হয় কবির বক্তব্যে। সভ্য নাগরিক জীবন প্রবাহ তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত কারণ ‘সভ্য মানুষের হৃদয় পাম গাছের আঁশের মত নরম নয়।’<sup>২৮</sup> আধুনিক ‘শিকারজীবী’ মানুষের কৃত্রিমতা, মুখ-মুখোশের আড়ালের ছদ্ম-প্রতারণার পরিবর্তে, তথাকথিত ‘অসভ্য’ মানুষের স্বাভাবিক ত্রুরতাও কবির কাছে শ্রেয় বলে মনে হয় —

“ও ভালুক তুমি আদিজন আমাদের  
ও ভালুক তুমি ফিরে গিয়ে বলো তাঁকে

ত্রুরকর্মেও আমাদের প্রীতিকথা

বনদেবতার রোষে আমাদের ডর  
ও ভালুক তুমি বলো তাঁকে অন্তত  
অবিনীত নই মাংসাশী বাধ্যত”<sup>২৯</sup> (‘ভালুক’/‘প্রাকপূরণ’)

‘ভালুক’ হয়ে ওঠে আদিম গোষ্ঠীজীবনের ‘Clan Totem’ বা জাতিগত টোটেম, যার মাধ্যমে একদিকে প্রকাশিত হয় কৌমসংস্কৃতির পারস্পারিক নির্ভরতা ও সহাবস্থান, অন্যদিকে গড়ে ওঠে বিশ্বাস ও সংস্কারের এক নিরবিচ্ছিন্ন মানসপ্রবাহের বোধ।

মানুষ পৃথিবীর অন্য সমস্ত প্রাণীকুলের থেকে অনেকাংশেই স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে তার ক্রমার্জিত প্রজ্ঞার নিরিখে, এগিয়েছে শত যোজন। তার জ্ঞান ও বোধ বিশেষভাবে আধারিত হয়ে গড়ে তুলেছে সুসংবদ্ধ জীবনবিন্যাস। তবুও, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তার চারপাশের জীব ও জড়পৃথিবীর সমস্ত উপাদানের সঙ্গে রয়েছে এক অদৃশ্য গ্রন্থিবদ্ধ সূত্র। মানুষের বোধের দর্পণে কখনও কখনও ভেসে ওঠে তার নিগূঢ় প্রতিচ্ছবি, নিজের সুগুণ সত্তায় প্রতিফলিত হতে দেখে সেই জীব বা জড়জগতের জীবনধর্ম। কখনও নিজের অবচেতনে ভেসে ওঠে আদিম জৈবিক প্রবৃত্তির প্রতিভাস। আবার, কখনও বিচ্ছিন্ন, শিকড়হীন মানুষ সেই প্রাণীজগতের কাছে শিখে নিতে চায় আদিম সজ্জীবনের পাঠ। এই নিবিড় বন্ধনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে তার শিল্প-সাহিত্যে, নির্মিত হয় মানুষের আত্মজ্ঞান ও বিশ্ববীক্ষার এক অভিনব অভিজ্ঞান, যা চিরায়ত হয়েও প্রতিনিয়ত নবব্যাঞ্জনায় প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

## Reference:

1. Macquarrie, John, ‘Existentialism’, 1<sup>st</sup> Reprinted Ed., London, Penguin Books, 1987. P. 79
2. Op. cit. P. 81
3. ঘোষ, সঞ্জীব, ‘অস্তিত্ববাদ দর্শনে ও সাহিত্যে’, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, নলেজ হোম, শ্রাবণ, ১৩৭৭, পৃ. ৭৮
4. চাকমা, নীরু কুমার, ‘অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা’, ২য় সং, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৭৪

৫. Noonan, Harold, W., 'Animalism Versus Lockeanism: Reply to Mackie', *The Philosophy Quarterly*, Vol. 51, No.202, January,2001, p.83
৬. Tylor, Edward, 'Primitive Culture Researchers into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom', Vol. 1, London, John Murray, p.285
৭. Frazer, James George, 'Totemism and Exogamy: A Treatise on Certain Early Forms of Superstition and Society', Vol. 1, London, Macmillan &Co., 1910 p. 4
৮. কুন্ডু, সুরশ্রী, 'সিম্বলিজম বা প্রতীকবাদ', নবেন্দু সেন(সম্পা.) 'পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যভাবনা', ১সং, কলকাতা, রত্নাবলী, ১৯৬২, পৃ. ২৯৯
৯. জামাল, সৈয়দ কওসর, 'সুররিয়ালিজম ও ফরাসি কবিতা', ১ম প্রকাশ, নিউ দিল্লী, হাওয়াকল, ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃ.৪০
১০. দাশ, জীবনানন্দ, 'আলোকপত্র', দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র', ২য় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, জুন, ২০২৩, পৃ. ৫৫১
১১. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'প্রথম প্রকাশের ভূমিকা', 'কবিতা সংগ্রহ ১৯৪৯-২০১১', ১ম সং, কৃষ্ণনগর, আদম, ২০১১ (পৃষ্ঠাসংখ্যা অনুল্লিখিত)
১২. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'উত্তরদ্বাদশ', 'গদ্যসংগ্রহ', কলকাতা, অবভাস, ২০১৩, পৃ. ৬২
১৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'ইঁদুর বা মাকড়সা', 'কবিতা সংগ্রহ ১৯৪৯-২০১১', ১ম সং, কৃষ্ণনগর, আদম, ২০১১, পৃ. ১৪২
১৪. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'হাতি', ঐ, পৃ. ১৫৪
১৫. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'গন্ডার', ঐ, পৃ. ১৮৯
১৬. মুখোপাধ্যায়, পবিত্র, 'গাধা', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', ২য় পরিবর্ধিত সং, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০২৪, পৃ. ৬৭
১৭. মুখোপাধ্যায়, পবিত্র, 'পিঁপড়ে', ঐ, পৃ. ৬৯
১৮. গুপ্ত মণীন্দ্র, 'ষাট দশকের কবিতা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), 'আধুনিক কবিতার ইতিহাস', ২য় সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর, ২০১৬, পৃ. ১৯৬
১৯. 'প্রিয় ভাস্কর : সুরত চক্রবর্তীর দশটি চিঠি', সুনীল চৌধুরী (সম্পা.), 'বোধশব্দ', সেপ্টেম্বর, ২০০৬, পৃ.১১
২০. ঐ, পৃ. ১২
২১. Dali, Salvador, 'Diary of Genius', Solar Books, 2006, P. 121
২২. চক্রবর্তী, ভাস্কর, 'মোষ', 'কবিতা সমগ্র ১', ১ম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ২০২৩, পৃ. ৪৩
২৩. চক্রবর্তী, ভাস্কর, 'জিরাফ', 'কবিতা সমগ্র ২', ১ম সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, এপ্রিল, ২০২৩, পৃ. ১০৬
২৪. ঐ
২৫. দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব, 'টিকটিকি', 'কবিতাসংগ্রহ', ১ম পুনর্মুদ্রিত সং, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, অক্টোবর, ২০২২, পৃ. ৯০
২৬. দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব, 'ইঁদুর', ঐ, পৃ. ১১০
২৭. গুপ্ত, মণীন্দ্র, 'সুধীর দত্ত প্রাকপুঁরাণ', 'দ্রাক্ষাপুঞ্জ গুঁড়ি ও মাতাল', ২য় মুদ্রণ, কলকাতা, অবভাস, পৃ. ১২৬
২৮. দত্ত, সুধীর, 'প্রাকপুঁরাণ উৎসর্গপত্র', 'কবিতাসমগ্র', ১ম সং, কলকাতা, সিগনেট, ডিসেম্বর, ২০১৭, পৃষ্ঠা অনুল্লিখিত
২৯. সুধীর দত্ত, 'আনুষ্ঠানিক', ঐ, পৃ. ১০১